করেন সেনাবাহিনীর একজন এনজিনিয়র ও শল্যচিকিৎসক। এঁরা রাষ্ট্রের কর্মকর্তা হলে কী হবে, এঁদের মননচর্চার ক্ষেত্রগুলি এঁদের সরকারি কর্মভারের চৌহদ্দির বাইরে অবস্থিত ছিল। প্রণালীবদ্ধ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ কেবল চারটি ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল – মানচিত্র আর জরিপকার্য, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূতত্ত্ব আর চিকিৎসাশাস্ত্র। চারটি ক্ষেত্রই ব্রিটিশ আর্থিক ও রাজনৈতিক-সামরিক স্বার্থর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। বিজ্ঞানের যেসব শাখার তাৎক্ষণিক ব্যবহারিক প্রয়োগের সম্ভাবনা কম, সেগুলোকে অবহেলা করত রাষ্ট্র – যেমন গণিত, পদার্থবিজ্ঞান আর রসায়ন। তবে লক্ষণীয়, উনিশ শতক পেরিয়ে বিশ শতকে প্রবেশের সময় এই ক্ষেত্রগুলিকে বিকশিত করে তুলেছিল ভারতীয়রাই।[৭১]

ব্রিটিশ বণিক, কর্মকর্তা আর সৈন্যদের থাকতে হত অপরিচিত এক আবহাওয়ায়, তার ওপর যুদ্ধ তো লেগেই ছিল। কাজেই নিছক টিকে থাকার জন্যই আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে চর্চা অপরিহার্য হয়ে পড়ল। আদতে ১৭৬০-এর দশকে বাংলায় যার সূত্রপাত, সেটাই পরে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস-এর রূপ ধারণ করেছিল (এই জিনিসটা একেবারে নিখাদ ঔপনিবেশিক উদ্‌ভাবন, এর কোনো পূর্বসূরি নেই– না প্রভুদেশে, না ভারতে)। ১৮৫৫ থেকে পরীক্ষা মারফত এই সার্ভিসে লোক নিয়োগ শুরু হয়। বিশ শতকের গোড়ার দিক অবধি এই সার্ভিস প্রায় পুরোপুরিই ইউরোপীয়-অধ্যুষিত ছিল। তবে অধস্তন পদগুলিতে 'নেটিভ' সহকারীর প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় দ্রুত মেডিক্যাল কলেজগুলোর পত্তন হয়, যার মধ্যে প্রথমটি স্থাপিত হয় কলকাতায় ১৮৩৫ সালে। প্রথম প্রথম বিভিন্ন ধরণের দেশি চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে কিছুটা আগ্রহ থাকলেও, ক্রমে তার জায়গা অনেকটাই নিয়ে নিল রোগনির্ণয় আর মহামারীর এক নতুন পরিবেশগত প্যারাডাইম, যা দীর্ঘদিন ধরে প্রাধান্য বিস্তার করে রইল।[৭২] দেশজ চিকিৎসার অভিজ্ঞতা আর জ্ঞানকে ছোটো চোখে দেখা হতে লাগল। অথচ একই সঙ্গে ভারতীয় জলবায়ুর তথাকথিত অদ্ভুত সব বৈশিষ্ট্য, যা নাকি তথাকথিত অস্বাস্থ্যকর সব অসুখের জনক, তার ওপর পূর্ণমাত্রায়, এমনকি অতিরিক্ত মাত্রায়, জোর দেওয়া হল। যার ফলে 'ট্রপিক্যাল মেডিসিন' নামে একেবারে ভিন্ন গোত্রের স্বতন্ত্র এক বর্গর উদ্ভব হল, যে-বর্গ একমাত্র ভারতের প্রতিই প্রযোজ্য। এরই দৌলতে রোগের জীবাণুতত্ত্ব ব্রিটিশ ভারতে স্বীকৃত হতে অনেক দেরি হয়ে গেল। কলকাতার এক জলাধারে কলেরা ব্যাসিলাস খুঁজে পেয়েছিলেন কখ, কিন্তু তখনকার মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠান সে-আবিষ্কারকে পাত্তা দেয়নি অনেক দিন। ম্যালেরিয়ার কারণ হিসেবে জলবায়ুর অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যকে

[৭১] চক্রবর্তী ২০০৪; ফালকি ২০১৩।

[৭২] দ্রষ্টব্য আলমি ২০০৭; শিবরামকৃষ্ণণ ২০০৬।

shot on moto g⁸ plus
Prasenjit's photography